চলচিত্রে উৎপল দত্ত

শিবকুমার রায়

অভিনেতা

এটা স্বীকৃত সত্য, চলচিচত্রের বহু প্রতিষ্ঠিত অভিনেতাই মঞ্চ থেকে এসেছেন। এ কারণে মঞ্চের কাছে সিনেমার ঋণ অপরিশোধ্য। তবে এ কথা বিদেশি সিনেমার ক্ষেত্রে যতটা প্রাচীন, আমাদের দেশে ততটা নয়। বিদেশে চিরকালই দেখা গেছে মঞ্চ থেকে শিল্পীরা এসেছেন এবং চলচিচত্রে সফলভাবে অভিনয় করে গেছেন। বহু অভিনেতাই সমান স্বাচ্ছন্দ্যে দুই জগতের বাসিন্দা থেকে গেছেন। পল মুনি, স্পেনসা ট্রেসি, ক্যাথারীণ হেপবার্ণ, ইনগ্রিডবার্গম্যান, লরেন্স অলিভিয়র ইত্যাদিরা উজ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেই ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মঞ্চের শিল্পীরা তাঁদের অভিনয়-শৈলীর পুরোন অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেন নি। সিনেমা যে এক স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আলাদা দৃষ্টিভংগী দাবি করে, তা এদের কেউ সম্ভবত প্রথম দিকে বুঝে উঠতে পারেন নি। শুধু মঞ্চের শিল্পীরাই নয়, মঞ্চের বাইরেও ছিলেন তাদের অভিনয়েও সেই থিয়েটারি ঢঙ আমরা দেখতে পাই। সুধু কি অভিনয়, সমস্ত চিত্র নির্মাণেই থিয়েটারের ছাপ সেই প্রযোজনাগুলিকে অর্থহীন করে দিয়েছে। এবিষয়ে বহু সমালোচকই বহুস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

পথের পাঁচালি সেই অসামান্য কীর্তি যা বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমায় ছবি তৈরির সব বিভাগেই আমূল পরিবর্তন সূচিত করল। তাদের মধ্যে অভিনয় কলাও একটি। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চূণীবালা, তুলসী চত্রবর্তী ইত্যাদির বাস্তববাদী অভিনয় আগেকার শিল্পীদের অভিনয়ের অবাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এর পরে বাংলা থিয়েটার থেকে যারা সিনেমায় এসেছেন তাদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। যদিও অনেকে সিনেমার সাথে নিজেদের সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি অনেক কারণে, তবু অনস্বীকার্য, মঞ্চের বহু শিল্পীই চলচিচত্রেও সমান নৈপুণ্য ও দক্ষতায় অভিনয় করেছেন। এ কথা অতিশয়োক্তি হবে না, এই শিল্পীদের সাহায্য ছাড়া বহু হিন্দি ও বাংলা ছবিই ব্যর্থ হত।

পথের পাঁচালি উত্তর বাংলা সিনেমায় শুধু নয়, ভারতীয় চলচিচত্রেও মঞ্চ থেকে যে মুষ্টিমেয় স্মরণীয় শিল্পব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে উৎপল দত্ত অন্যতম। বলরাজ সাহানী, ছবি বিশ্বাস, নাসিদ্দিন সা, শ্রীরাম লাগু ইত্যাদির কথা স্মরণে রেখেই একথা বলা যায়। হিন্দি ও বাংলা সিনেমায় এখন ছবির সংখ্যা কম নয়, যেখানে উৎপলবাবুর অনুপস্থিতি ছবির শিল্পোৎকর্ষ বাতিল করে দিতে পারে। অথচ öবলে আশর্স্র লাগে উৎপল দত্তের মত প্রতিভাকেও চলচিচত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘকাল। তাহলে কি তাঁর মত অভিনয় প্রতিভার পক্ষেও, চলচিচত্রের আঙ্গিকে নিজের অভিনয় শৈলীকে মানিয়ে নেওয়ার প্র্ন দেখা দিয়েছিল। এই মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা আসলে অন্যরকম চেহারাও নিতে পারে। কারণ, কি থিয়েটার কি সিনেমা, সব অভিনেতাকেই প্রতি মাধ্যমে একটা নিজস্ব অভিনয় স্টাইল বের করে নিতে হয়। যে কোন শিল্পমাধ্যমেই এ কথা সত্য। এই স্টাইল না আসা পর্যন্ত একজন শিল্পীকে তার মাধ্যমে সফল ও সার্থক জ্ঞান করা হয় না। আর এই সাফল্যের উপর নির্ভরশীল থাকে বহুতর দর্শক মানসে শিল্পীর গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তার প্র্নটি।

কাজেই একটি বিশেষ কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পীকে তার প্রর্থিত ব্রেক্থ্রু অর্জন করে নিতে হয়। আর একজন শিল্পীর জীবনে এই ব্রেকথ্রুর পিছনে যে বিশাল শ্রম ও নিষ্ঠা এবং যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা কাজ করে তার কথা আমরা অনেকে খেয়াল করি না। উৎপল দত্তের ক্ষেত্রেও ১৯৫০ সালে মধু বসুর মাইকেল মদুসূদন ছবিতে নাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ সত্ত্বেও অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেই ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত, যখন মৃণাল সেন নির্মিত ভূবন সোম তাঁকে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান দিল। শিল্পী যেন এখান থেকেই চলচিচত্রাভিনয়ের এক বিশেষ স্টাইল করায়ত্ত করলেন, যা তাঁর পরবর্তী বহু ছবিকে দর্শকের কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। উৎপল দত্ত না থাকলে যেমন ভুবন সোম হতনা, আবার ভুবন সোম না থাকলে চলচিচত্রের উৎপল দত্ত হয়ত অনাবিষ্কৃতই থেকে যেতেন। কাজেই শিল্পীর প্রস্তুতিও অনেক সময় বড় প্র্ন নয়, বড় প্র্ন হয়ে দাঁড়ায় উপযুক্ত কাজের সুযোগ, যে কাজ শিল্পীকে এক প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পী ও শিল্পকর্ম দুজনেই যে দুজনের কাছে ঋণী, কৃতজ্ঞ।

মাইকেল মধুসুদন ছবিতে উৎপল দত্তের অভিনয় প্রশংসা পেলেও উৎপলবাবু তাঁর অভিনয় সম্পর্কে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সম্প্রতি প্রয়াত প্রবীণ চিত্র পরিচালক ও সমালোচক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর অতীতের অ্যালবাম (চিত্রভাষ পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত) রচনায় উৎপল বাবুর অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন এই সময়ে মধু বসুর সামনে হাজির হলেন লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রোডিউসার উৎপল দত্ত। মধুবাবু দেখলেন ছেলেটি চমৎকার ইংরিজি বলে, যাকে বলে কিংস্ ইংলিস। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে বেশ জড়তা আছে।.......উৎপল নিজে যদিও এই ভূমিকাভিনয়ে সাহস করছিল না, কিন্তু মধুবাবু তাকেই সাহস যোগালেন ঐ ভুমিকা গহণ করতে ১৯৫০ থেকে ১৯৬৯ - এই দীর্ঘ সময় অভিনেতা নিজেকে একের পর এক ছবিতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ চরিত্র রূপদানের মধ্য দিয়ে ধৈর্য সহকারে তৈরি করেছেন। থিয়েটারের বিশাল অভিজ্ঞতাকে চলচ্চিত্রাভিনয়ে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে নিবিড় চিন্তা করেছেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় স্থির থেকেছেন।

ভুবন সোম -এর আগের অন্যান্য ছবির মধ্যে আইভরি-মার্চেন্ট পরিচালিত শেক্সপীয়রওয়ালা (১৯৬৪) ও দি গু (১৯৬৯) এই দুটি ইংরাজি ছবিতে উৎপল দত্ত অভিনয় করেন। শেষ ছবিতে তিনি এক সেতার বাদকের মূল চরিত্রে অভিনয় করেন। এ বাদে এ পর্বে তাঁর অভিনীত কয়েকটি ছবি হল বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র, শেষ অঙ্ক, অবশেষে চৌরাঙ্গী, মোমের আলো ইত্যাদি। ভুবন সোমই তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। এ সময়ে তাঁর পরিচালিত দুটি ছবি হল মেঘ (১৯৬০) এবং ঘুম ভাঙার গান (১৯৬৪)। দ্বিতীয়টিতে তিনি অভিনয়ও করেন।

ভুবন সোমের সাফল্যই যে তাঁকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান দিয়েছিল তার প্রমাণ---উল্লিখিত ছবির মুক্তিপ্রাপ্তির পরই তাঁকে আমরা ক্রমান্বয়ে হিন্দি এবং বাংলা সিনেমার খ্যাতনামা পরিচালকদের ছবিতে অংশগ্রহন করতে দেখি। অন্যান্য বছরে যেখানে অভিনীত ছবির সংখ্যা থাকত গড়ে তিন কি চার, সেখানে ১৯৭২ সালে তিনি মোট দশটি ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৭৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ভীতিপ্রদ ১৯এ।

মৃণাল সেন থিয়েটারের একজন উৎসাহী দর্শক। তাঁর সব ছবিতেই কম বেশি থিয়েটারের অভিনেতারা ছোট বড় বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন। ভুবন সোম ছবিটির (কাহিনী বনফুল) চিত্রনাট্য তিনি উৎপলবাবুকে প্রধান চরিত্রে মনে রেখেই পরিকল্পনা করেছিলেন। একজন আমলার কঠোরতর মুখোসের অন্তরালে যে স্বাভাবিক মানুষটি থাকে তাকে একটি গ্রাম্য মেয়ের সরলতার সামনে উপস্থিত করা এবং শেষ মুহুর্তে তাকে দিয়ে এমন একটা কিছু অভাবিত করিয়ে নেওয়া যা দর্শক হিসেবে আমাদের সকলকে এক ক্ষরিষ্ণু সমাজব্যবস্থার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই ব্যাক্তিত্বে একই সময়ে বিভিন্ন বিচিত্র আবেগ অনুভুতির সমাবেশে চরিত্রটি যে এক অনন্য বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধি লাভ করে তাকে অভিনয়ে রক্ত মাংসের প্রাণময় সত্ত্বাদান খুবই দুরূহ কাজ। আমরা দেখি অবস্থা বিশেষে ভুবন সোমের মানসিক বিন্যাস কখনো অভিজাত, কখনো গম্ভীর, কখনো সরস, কখনো কঠিন, কখনো ব্যঙ্গময়, কখনো কৌতুকপ্রিয়। পরিচালক এক বিরল নৈপুণ্যের সঙ্গে এই সব আপাত বিরোধী মানসিক ভাবগুলিকে একত্র করে এক বহুবর্ণলাঞ্ছিত মোজাইক নক্সা তৈরি করেছেন। নায়কের এই সতত পরিবর্তনশীল মুড্ অদ্ভুত সব কমপোজিসনের আশ্রয়ে ক্যামেরার উদ্ভাবনী প্রয়োগে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা হয়েছে। কিন্তু এ সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি উপযুক্ত অভিনয়ের দ্বারা চিত্রনাট্যকে চিত্রময় করে তোলা না যায়। উৎপলবাবু এক্ষেত্রে সেই অসাধ্যসাধন করেছেন। থিয়েটারে অর্জিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়া অভিনয়ে এই শ্রেণীর ভাবপ্রকাশ একান্ত অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে একটু অন্যরকমভাবে উৎপলবাবু ডেবানেয়ার পত্রিকার অনিল গ্রোভারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'Only in this country and its proportion of ignoramuses being rather high, they keep saying there's such a sublte difference between the stage and the film ; there's such a vast difference that film actors don't need the theatre ! It's only trying to justify your incompetence. They're just incompetent mumbling idiots, not actors. It's only these half-witted mumble's who come into films directly and dare to call themselves actors. Actors, bullshit ! They don't know a bloody thing about acting.'

দুঃখের বিষয় উৎপবাবুকে দিয়ে খুব কম পরিচালকই এ ধরণের প্রচেষ্টায় হাত দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁকে জনঅরণ্য (১৯৭৬) থেকে শু করে বেশ কিছু ছবিতে নানা চরিত্রে দায়িত্ব দিয়েছেন। যেমন, জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮), হীরক রাজার দেশে (১৯৭৯) এবং আগন্তুক (১৯৯২)। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আগন্তুক-এ মামার চরিত্রে তাঁর রূপদান। মৃণাল সেনের মত সত্যজিৎবাবুও এ চরিত্রটি তাঁকে মনে রেখেই নির্মাণ করেছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, উৎপল দত্ত ছাড়া এ শ্রেণীর ঘটনাবিহীন ছবিতে

শুধু মাত্র সংলাপ ও চোখমুখের অভিব্যক্তি সাহায্যে একের পর এক দৃশ্যে দর্শককে মোহাবিষ্ট করে রাখার ক্ষমতা দ্বিতীয়জন বলতে অ ার ছিল শুধু ছবি বিশ্বাসের। আগুন্তুক-এ উৎপলবাবুর মুখমন্ডলই কেবল যেন অভিনয় করে গেছে। তাঁর দৃষ্টিতে কখনো সরব থাকে বিস্ময়, কখনো রহস্য, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো ঘৃণা, কখনো অভিমান, কখনো তিরস্কার ও ক্ষোভ----- মানুষের মূল আবেগ অনুভূতির সমস্ত বিস্তার যেন এখানে দু জোড়া চোখের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে। রহস্যঘন এক অসীম বিশালত্বের ব্যঞ্জনা যা আমাদের মনে অন্তহীন মহাবিশ্বের নীহারিকাপুঞ্জের উপমা আনে---আর কোন ব্যক্তির অবয়বে এভাবে ধরা দেয় না।

নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বাংলা ও হিন্দি সিনেমার বহু পরিচালক - প্রযোজক তার মত একজন অভিনেতাকে দিয়ে কি ধরণের স্থূল ও নিম্নমানের ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছেন, তা ভাবলে আমাদের সত্যিই বিষণ্ণ হতে হয়। ভুবন সোম ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে তাঁর অভিনয়ের যে একটা সিরিও-কমিক চেহারা দর্শকের মনে ভীষণভাবে মুদ্রিত ও গৃহীত হয় তার ফলে তাঁকে পরবর্তী বছরগুলিতে হয় এই পাওয়ারফুল বস্ নতবা কোন ওয়েস্টারনাইজ্ড ভিলেন আর তা না হলে একেবারেই সাদামাটা কোন বাফুনের ভূমিকায় বার বার আবির্ভূত হতেহয়েছে। এর জন্য আমরা উৎপলবাবুকেও দায়ী করতে পারি। অনেকে আবার তাঁর মত একজন কমিটেড শিল্পীর পক্ষে এ ধরণের ছবিগুলিতে অভিনয় করার মধ্যে আত্মিক সংসক্তির অভাববোধ লক্ষ্য করেছেন। এ ব্যাপারে অনিল গ্রোভার তাঁকে প্রশ্ন করলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

অনিল ঃ ‘How do you explain the lack of artistic integrity in accepting some of the tritest roles possible ?”

উৎপল ঃ ‘I'm asking you to mention specifically. Before you come to interview someone, will you kindly inform yourself of the parts this actor has played ? And not go on repeating what certain fools may be spreading for their own interest. We try to take only such parts as are commensurate with an artist's aspirations, but certain things always happen. And why do you exclude Amanush from this kind of trite films?’

অনিল ঃ ‘For the simple reason that the role had something definite to offer to you as an artist.’

উৎপল ঃ ‘Or may be this role was created by the actor in such a manner that it did not appear that it was rubbish ? I'm doing Shque directed by Aruna and Vikas Desai and I'm very proud of it. It is a role of a psychopath murderer who hasn't slept for ten years. I'm enjoying every single minute of it as an artist. I play a Sardarji here. I will be doing Bandi, based on the prisoner of Zenda, and we are all looking forward to begin work on Tarun Mujumder's Ganadevata—in Bengali of course.’

নিঃসন্দেহে, শিল্পীর অভিনয়ে অনেক তুচ্ছ ভুমিকাও অসাধারণত্বের মহিমায় ধন্য হতে পারে। হয়েছেও বহুবার। তবে একই ধরণের রে াল একাধিকবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে একমাত্র অর্থাগম বাদে আর কোন উচ্চাশাই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে না, তা আমরা সবাই বুঝি, এখানে কোন যুক্তিই কার্যকর হয় না।

বাণিজ্যিক সিনেমা উৎপলবাবুকে কি পরিমাণ ব্যস্ত রেখেছিল, অন্য কোন কাজই তাঁকে সুস্থ এবং ধীর স্থিরভাবে করতে দেয় নি, তার একটা খতিয়ান তৈরি করা যেতে পারে। ১৯৭২ সালে, আমরা আগেই বলেছি, মোট দশটি ছবি। এর মধ্যে কলকাতা ৭১, নিশিয াপন, ঠগিণী, মর্জিণা আবদল্লা ইত্যাদি বাংলা ছবি যেমন আছে, আবার আছে হানিমুন, পিঙ্কী, মিঃ রোমিও এবং পরিবর্তন - এর মত হিন্দি ছবিও। ১৯৭৩ সালে ৮টি। উল্লেখ্য হল শ্রীমান পৃথ্বিরাজ, শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন, অমানুষ (বাংলা ও হিন্দি) ইত্যাদি বাংলা, মাই ফ্রেন্ড্ রইস, বেদনা ইতাদি হিন্দি ছবি। ১৯৭৪---১৪টি। বিকেলে ভোরের ফুল, কোরাস, রোদন ভরা বসন্ত, ফুল্লেশ্বরী ইত্যাদি বাংলা, এবং কিতনে পাস কিতনে দূর, জুলী, ইমান ধরম ইত্যাদি হিন্দি ছবি। ১৯৭৫--১৯টি। মোহনবাগানের মেয়ে, সেই তোখ, জনঅরণ্য, দত্তা, সিস্টার, ইত্যাদি বাংলা এবং দো আনজানে, শেক্, ঝিন্দের বন্দী, ইয়ে হ্যায় জীন্দেগী, ইত্যাদি হিন্দি ছবি। এইভাবে দেখা যবে পরবর্তী বছর গুলিতেও উৎপলবাবু হিন্দি বাংলা ধরে গড়ে ১৭ -- ১৮টি করে ছবি করেছেন। আবার আরেকরকম ভাবেও আমরা জিনিসটিকে দেখতে পারি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পরিচালকরা তাঁকে তাদের কোন কোন ছবিতে অভিনয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তারও একটি স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করে শিল্পীর বিশাল প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। সত্যজিৎবাবুর কথা অ

াগেই বলেছি। ভুবন সোম বাদে মৃণাল সেন উৎপল দত্তকে তাঁর ইন্টারভিউ (১৯৭০), এক আধুরী কহানী (১৯৭২) কলকাতা ৭১ (১৯৭২), কোরাস (১৯৭৪), চালচিত্র (১৯৮১) ছবিতে অভিনয় করান। তণ মজুমদারের বহু ছবিতে শিল্পীকে অভিনয় করতে দেখি, যেমন --- কুহক (১৯৫৮), ঠগিণী (১৯৭২), শ্রীমান পৃথ্বিরাজ (১৯৭৩), ফুলেশ্বরী (১৯৭৪), সংসার সীমান্তে (১৯৭৪), মেঘমুক্তি (১৯৮২), ভালোবাসা ভালোবাসা (১৯৮৫) পথভোলা (১৯৮৬), আগমণ(১৯৮৮), পরশমণি (১৯৯০), সজনীগো সজনী (১৯৯১), পথ ও প্রাসাদ (১৯৯২)। তপন সিন্হার সফেদ হাতি (১৯৭৭), আজ কা রবীন হুড (১৯৮৬), টেট্রা (১৯৮৬) ইত্যাদি হিন্দি ছবিতে। দীনেন গুপ্তের নিশি যাপর (১৯৭২), মর্জিনা আবদল্লা (১৯৭২), নিশি মৃগয়া (১৯৭৫) স্বয়ংসিদ্ধ (১৯৭৫), সানাই (১৯৭৭), তিলোত্তমা (১৯৭৮), কলঙ্কিণী (১৯৮১), ইন্দিরা (১৯৮৩), রাশিফল (১৯৪৮), ইত্যাদি বাংলা ছবিতে। ঋত্বিক ঘটকের একটিমাত্র ছবিতে উৎপলবাবু অভিনয় করেন, তা হলে যুক্তি তক্ক গপ্প (১৯৭৭)। রাজেন তরফদারের পালঙ্ক (১৯৭৫) ছবিতে অভিনয় করেন। এ বাদেও উৎপলবাবু বিভিন্ন পরিচালকের নেতৃত্বে বহু হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেন। এরমধে উল্লেখযোগ্য, ঋষিকেশ মুখার্জীর গুড্ডি (১৯৭১), গোলমাল (১৯৭৯), কোতয়াল সাহেব (১৯৭৯), মোমদিদি (১৯৮০) নরম গরম (১৯৮১, রঙবেরঙ্গী (১৯৮২), কিসিসে না কহনা (১৯৮৪)। শক্তি সামন্তের অমানুষ (১৯৭৩), চরিত্রহীন (১৯৭৪), গ্রেট গ্যাম্বলার (১৯৭৫), আনন্দ আশ্রম (দ্বিভাষিক (১৯৭৭), অনুসন্ধান (১৯৭৮), অন্যায় অবিচার (১৯৮৫)। বাসু চ্যাটার্জীর স্বামী (১৯৭৭), প্রেম বিবাহ (১৯৭৯), আপনে পারায়ে (১৯৭৯), হামারি বহু অলকা (১৯৮১), শৌকিন (১৯৮২), পসন্দ আপনি আপনি (১৯৮৩)। এছাড়া অন্যান্য হিন্দি ছবি বলতে চেতন আনন্দ-র হীর রান্জা (১৯৭০), সুবোধ মুখার্জীর মিঃ রোমিও (১৯৭২), উল্টা সিধা (১৯৮১), হীরেন নাগ-এর হানিমুন (১৯৭২), গুলজার -এর বেদনা (১৯৭৩), আঙ্গুর (১৯৮১), ডি, এস, সুলকানিয়া কিতনে পাস কিতনে দূর (১৯৭৪), দুলাল গুহ-র দো অ নজানে (১৯৭৬), নবেন্দু ঘোষ - এর ডাক্তারবাবু (১৯৭৫), অমৃত নাহাটার কিস্সা কুরসি কা (১৯৭৭), তারাচাঁদ বরজাতিয়ার খে য়াব (১৯৭৯), কেতন আনন্দ-এর টুটে খিলোনে (১৯৭৮), বিজয় আনন্দর রাম বলরাম (১৯৮০), কে রাঘবেন্দ্র রাও -এর নিশানা (১৯৮০), মোহন সেগাল-এর এক হি রাস্তা (১৯৮২), গৌতম ঘোষের পার (১৯৮৪), টি, রামা রাও-এর ইনকিলাব (১৯৮৪), রাম সাহিব - এর লড়াই (১৯৮৯), রবি সোনির জান পেহচান (১৯৯০)।

উৎপল দত্তের হিন্দি উচ্চারণকে বোম্বের এক শ্রেণীর চলচ্চিত্র সমালোচক যখন বিকৃত ও বাংলা ভাষার প্রভাবদুষ্ট আখ্যা দেন তখন ধীমান শিল্পী সে অভিযোগ ধুলিসাৎ করেন তাঁর নিজস্ব যুক্তির প্রাচুর্যে। তাঁর মতে, তাঁর হিন্দি কখনোই বাংলা ভাষার কোন ছাপ বহন করতে পারে না, কারণ, তিনি উর্দু পড়তে ও লিখতে জানেন। তাঁর কথায়, বোম্বের খুব কম লোকই নির্ভুল হিন্দি বলতে পারেন। পাঞ্জ াবী ভাষার প্রভাব তাঁর হিন্দি উচ্চারণে থাকতেই পারে, তাতে আসল কাজে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। বোম্বের ফিল্মি দুনিয়া যে হিন্দি ভাষায় অভ্যস্ত তা আসলে কিছুটা হিন্দি আর কিছুটা উর্দুর মিশ্রণ। শর্মিলা ঠাকুরের পক্ষে শাবানা আজমির মত হিন্দি বলা অসম্ভব, কারণ, শাবানা হল কাইফীর মেয়ে। যুক্তির অংশটুকু উৎপলবাবুর নিজস্ব অনবদ্য ইংরাজিতে শোনা যাক্, উৎপল 'We have seen German actors speaking English with a horrible accent, but nobody minds that—they are admired for their histrionics alone. In this country there are seventeen different languages and Bombay embraces all kings of Hindi. Why shouldn't Maharashtrian speak Hindi as a Maharashtrian would? When Dharmendra speaks Hindi with a Punjabi accent, what's wrong with that ? I like Dharmendra's Punjabi accent. When Suchitara Sen was doing Andhi, she didn't care a hang for her Hindi. Instead she concentrated on her acting…..I plead guilty of having a Punjabi accent ; I have no Bengali accent. And I am very proud of my Punjabi accent…….'

চলচ্চিত্র নির্মাতা

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে উৎপল দত্তকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও সেরকম কিছুহয় নি। যে পাঁচটিপূর্ণ দৈঘের ছবি---মেয (১৯৬০-৬১), ঘুম ভাঙার গান (১৯৬৩-৬৪), ঝড় (১৯৭৮), বৈশাখী মেঘ (১৯৮০-৮১), মা (১৯৮২-৮৩) এবং ইন সার্চ অফ্ থিয়েটার (চার পর্ব বিশিষ্ট টি ভি ডকুমেন্টারি সিরিয়াল) তিনি নির্মাণ করেছিলেন যার সাহায্যে তিনি, দুঃখের বিষয়, সমালোচক, বে াদ্ধা এমন কি নিছক সাধারণ দর্শক কারোরই মনোযোগ উল্লেখযোগ্যাভাবে আকর্ষণ করতে পারেন নি। ছবিগুলির দুর্বলতা বাদেও অ ার যে অতিরিক্ত কারণ এর জন্য দায়ী তাহল---উৎপবাবুর প্রধান পরিচয় থিয়েটার ব্যক্তিত্ব হিসেবে। চলচিËত্র তাঁর উপস্থিতির প্রসঙ্গ উঠলেই মনে তাঁর অভিনেতার ইমেজই বড় হয়ে দেখা দিত। এটা তো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি শিল্প সাহিত্যের একাধিক বিভ াগে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট বিভাগের পরিচয়ই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

তুলনায় অন্য বিভাগে যোগ্যতার স্বীকৃতি ম্লান হয়ে দেখা দেয়। উৎপল বাবুর ক্ষেত্রে সেটা যে একেবারেই হয় নি, তা বলা যাবে না। যেমন অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাঁর পূর্ণ সামর্থের কালে তাঁর অসাধ±রণ ইংরাজি আবৃত্তি - ক্ষমত াকে অক্ষয় রাখার জন্য কেউ কোনদিন তাঁকে দিয়ে তাঁর প্রিয় বিষয় শেক্সপীয়রের টেক্সট্ থেকে নির্বাচিত অংশ তাঁর দুর্লভ কন্ঠে রেকর্ড করে রাখার কথা ভাবেনি। সপ্তপদী ছবিতে ওথেলো নাটকের যে সামান্য অংশটুকু পাওয়া যায়, মনে হয়, ঐটুকুই আমাদের একমাত্র মূলধন।

উৎপলবাবু যদিও আজীবন থিয়েটার নিয়েই মগ্ন থেকেছেন তবু চলচিচত্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটা চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। কি থিয়েটার কি চলচিচত্র সব কিছুই তিনি নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে বিচার করার চেষ্টা করছেন। কোন শ্রেণীর চলচিচত্র নির্ম াণে তিনি ঋিাসী এ প্রশ্নর সম্মুখীন হলে তিনি বাণিজ্য ও শিল্পের মাঝামাঝি এক পথ অনুসরণের কথা বলতেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পা র্টির রাজ্য কমিটিকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক অসম্পূর্ণ পত্রে তিনি ভবিষ্যৎ চলচিচত্র নির্মাণ- নীতির ভিত এইভাবে স্থির করেছেন, "At present most of the so-called "Good" films are totally alienated form the masses. They are explicitly directed at a petty – bourgeois elite, and these elitist directors proudly proclaim that the masses are too backward to understand their masterpieces. In actual fact, these films are so revoltingly dull and deal with such insignificant middle-class themes, that the masses have no earthly interest in sitting through them.' ত াহলে নিনেমা কাদের জন্য তৈরি হবে? সে বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, A film must always be aimed at the masses of Workers and peasants. All popular films are not good, but a good film must always necessarily be popular.' এই অ াদর্শেই তাঁর ছবিগুলি তিনি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

উৎপল দত্তের প্রথম ছবি মেঘ পরিচালকের উপরোত্ত নীতি থেকে কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করে। রবি শংকরের সংগীত, রামানন্দ সেনগুপ্তের ক্যামেরা, উৎপলবাবুর স্প্টি ও পরিচালনায় যারা এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন অনিল চ্যাটার্জি (সাগর সেন), মালবিকা গুপ্ত (মাধুরী), নীলিমা দাস(সুজাতা সেন), উৎপল দত্ত(সমরেশ সান্যাল) জহন, রবি, শোভা, হারাধন ইত্যাদি। ছবির কাহিনী সূত্রটি এই রকম ---সাগর সেন ধূর্ত ব্যবসায়ী। সমরেশ সান্যাল হলেন একজন ঔপন্যাসিক যিনি মানসিক বিপর্যয় ও স্ন ায়বিক দুর্বলতা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। সাগর সমরেশকে প্ররোচিত করে এক হাতের পরিকল্পনা রূপায়ণে সক্রিয় হতে। এর ফলে সে তার স্ত্রী সুজাতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, যে সুজাতার সাধে সমরেশ-এর একটা সম্পর্ক ছিল। সাগর সুজাতাকে লেখা সমরেশের একগুচ্ছ প্রেমপত্রও নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। সুজাতাকে পাওয়া যায় না। সমরেশ এর একজন প্রতিবেশীর সন্দেহ হয় যে, সমরেশই সুজাতাকে হত্যা করে তার মৃতদেহ বাড়িতেই কোন ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। পুলিশও তল্লাসির কাজে নেমে পড়ে। কিন্তু গোটা রহস্যটা সমরেশের বৌ মাধুরী সমরেশ সমেত সকলের কাছে সমাধান করে এই ভাবে যে, কোন হত্যাকান্ডের ঘটনাই আসলে ঘটে নি, সুজাতাই তার কাছে গোপনে স্বীকার করেছে যে, সমরেশ এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে গা ঢাকা দিয়েছে।

বলতে হবে, ছবির ষ্ট্রাকচার হল কমিক থ্রিলারের। বিশেষ কিছু বত্তব্য সামনে রেখে পরিচালক এ ছবি করতে নামেন নি। মনে হয়, ছবি নির্মাণের নীতির প্রশ্নটিও তার মনে এ সময়ে পরিষ্কার ভাবে দানা বাঁধে নি। এ ছবি দেখতে এ অস্বস্তিকর উৎকন্ঠা বা উত্তেজনা অবশেষে এক সমবেত স্বস্তির শ্বিাসে বিলীন হয়। আঙ্গিকগত দিক থেকে নতুনত্বের উপাদান দাবি করার মত কিছু এ ছবিতে নেই। যদিও স্বাভাবিক কারণেই সংগীত ও ক্যামেরা যোগ্য লোকের হাতে থাকার জন্য বিশেষ কতগুলি মুহূর্তে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

পরবর্তী ছবি যুম ভাঙার গান উৎপল দত্তের ছবিগুলির মধ্যে নানা কারণে উল্লেখ্য হয়ে আছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা উৎপল দত্ত, সংগীত ঃ রবিশংকর, ক্যামেরা ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত , এবং অভিনয়ে জহর রায়, শোভা সেন, অনিল, চা প্রকাশ ঘোষ, শেখর, ম াধবী এবং ৫০০০ শ্রমজীবি মানুষ।

অনস্বীকার্য, এর আগে বাংলা তথা ভারতীয় আর কোন ছবিতে আমাদের শ্রমজীবন ও শিল্পাঞ্চলকে এভাবে ধরা হয় নি। কলকাতার ক াছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন কল - কারখানায় বস্তির অন্ধকার ভয়ংকর পরিবেশে পরিচালক তাঁর ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। ভ ারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংঘর্ষের চেহারাকে দৃশ্যময় করে তোলার জন্য পাঁচ হাজার শ্রমিক এই ফিল্মের বিভিন্ন দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মিছিল, ধনিক শ্রেণী গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক ইউনিয়ন নেতাদের উপর বোমাবাজি, ইউনিয়ন সেক্রেটারীদের হত্যা, বিজয় সম াবেশ, মালিক পক্ষের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর দ্বারা শ্রমিকদের আস্তানায় আক্রমণ ----এ সব কিছুই অতীতের অনেক বাস্তব যুদ্ধের

পরিবেশে গৃহীত হয়েছে। এবং এই ভাবেই তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম বিস্তৃত চিত্রণ। এ সব কিছুর পিছনে যে নির্মম কঠিন সত্য বিরাজ করে তা হল এ দেশে শ্রমজীবি মানুষ এতই অপরিণত পুষ্টির শিকার যে তার গড় আয়ু ৩৮ বছরের সীমা ছাড়ায় না। ছবির কাহিনী এই রূঢ় বাস্তবের প্রতীকি রূপায়ণ।

ছবির কাহিনী ----একজন সাধারন শ্রমিক হরি ও তার স্ত্রী গৌরী, তাদের ছেলে সুধীরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার বিষয় দিয়ে শু হয়। মা-বাবা তাদের ছেলেকে যে কোন মূল্যে চরম আত্মত্যাগের বিনিময়েও এক আদর্শ বংশীবাদক করে তুলতে চায়। বাঁশি ভালো বাজাতে গেলে ফুসফুসের জোর লাগে, তাই হরি ও গৌরী নিজেরা কিছু না খেয়ে ছেলেকে ডিম দুধ খাওয়ায়। সুধীর একটি মেয়ের প্রেমে মগ্ন হয়। ফ্যাক্টারিতে স্ট্রাইক্ লাগে। কোম্পানির গুন্ডারা শ্রমিকদের আত্রমণ করে, সারারাত বস্তির অলিতে-গলিতে যুদ্ধ চলে। এরই মধ্যে একটি স্বল্পালোকিত গরে বাবা-মা ও ছেলো তিনজনে মিলে স্বপ্নে বিভোর হয়, ভাবে এই বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু বাস্তবের নিয়মে তারাও ব্যাপক তান্ডব লীলার শিকার হয়। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা ছেলের শরীরের দিকে নজর দিতে পারে না। বাঁশিরিপরীক্ষায় জলিল খানের কাছে দুর্বল সুধীর ফেল কবে। মত পাল্টিয়ে হরি ছেলেকে ফ্যাক্টরিতে ঢোকায়। কিন্তু মা তার আশা ছাড়েন না। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুধীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। গৌরী কিন্তু ব্যাপারটাকে আরেকবার দেখতে চায়। সে ছেলেকে ওস্তাদের কাছে আবার যেতে রাজি করায়। কিন্তু কোম্পানি ত্রেন চালককে ঘুষ দিয়ে ইউনিয়ন নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ফলে যে ত্রেন দুর্ঘটনা ঘটে তাতে নেতার কাছে দন্ডায়মান সুধীরওগলিত আগুনের লাভায় পুড়ে মারা যায়। এর সাথে পুড়ে ছাই হয় মা-বাবার বহু আদরের স্বপ্নও।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, প্রতীক হিসেবে হরি গৌরী ও সুধীরের কাহিনী শ্রমিক জীবনের বাস্তব আশা আকাঙ্খার প্রেক্ষাপটে কতখানি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। নাটক গোটা সমস্যার চিত্রণটাই মধ্যবিত্তের চোখে দেখা এক দূরবর্তী সম্পর্কহীন বিষয় থেকে গেছে যা আমাদের আকর্ষণ করে না। সুধীরের আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছবি যে সহজ সমাপ্তির পথ খুঁজে নেয় তাও আপত্তিকর মনে হতে পাবে। আপত্তিকর মনে হবে, ছবির অন্ধকার নৈরাশ্য যা শ্রমজীবি মানুষের কাহিনীতে স্থান পাওয়া উচিৎ নয়। এ সব সত্ত্বেও পরিচালকের কঠোর সামাজিক দায়বদ্ধতা যা ছবির অন্যান্য বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকে তা সবার প্রশংসা দাবি করে।

পরবর্তী ছবি ঝড়, কাহিনীর দিকে থেকে অনেক বেশি সংহত। কবি ও শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র জীবনের শেষ দুই বছরের ঘটনা নিয়ে ছবির গল্প তৈরি হয়েছে। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও তারই ছাত্র--দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, পিয়ারী চাঁদ মিত্র, গোবিন বসাক এবং অন্যান্যদের নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সন্দেহ ও দেশপ্রেমের আদর্শ শিক্ষা দেন। সরস্বতী নামে একটি মহিলাকে সতীদাহের কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিজের কাছে আশ্রয় দিলে নহুশ শর্মার উস্কানিতে রাধাকান্ত দেব ডিরোজিওর বিদ্ধে চত্রান্তে অবতীর্ণ হন। দেবের লড়াই ডিরোজিও-র ভাবাদর্শের বিদ্ধে নয়, তার অহমিকার জবাবে, কারণ তিনি দেবের হাতে সরস্বতীকে তুলে দিতে অস্বীকার করছেন। হিন্দু ধর্মান্ধদের ডিরোজিওর বিদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হয়। সতীদাহ প্রথার বিলোপের পর সরস্বতী ঘরে ফিরে এলে নহুশ শর্মা তার ছেলেকে অত্যাচার করে সরস্বতীর কাছ থেকে এই অভিযোগ আদায় করে নেয় যে, ডিরোজিও তার সতীত্ব নষ্ট করেছে। এমনকি দক্ষিণারঞ্জনও তার শিক্ষকের বিদ্ধে সাক্ষী দেয়। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে থেকে বরখাস্ত হন। কিন্তু তিনি হার স্বীকার করেন না। হিন্দু কুসংস্কার ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে তার জিহাদ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে সরস্বতীও তাকে অপমান করে। তার ছেলে মারা যায়। ডিরোজিও কলেরায় আত্রান্ত হন। তার ছাত্ররা কলেজের নিয়ম লঙ্ঘণ করে তার পাশে সমবেত হন। এই সময় বাইরে তার কুশপুত্তলিকা পোড়ান হতে থাকে। রেড্ হিল ডিরোজিওকে অনুরোধ করেন ঈশ্বরের সাথে শান্তি স্থাপনে। ডিরোজিওর উত্তর---কিন্তু ঈশ্বর প্রমাণিত সত্য নন। ছবিটির প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ক্যামেরা ঃ দীনেন গুপ্ত, সংগীত ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদনা ঃ ঋষিকেশ মুখার্জী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ উৎপল দত্ত। অভিনয়ে উজ্জ্বল সেনগুপ্ত (ডিরোজিও), ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় (আন্না ডিরোজিও), সমীর মজুমদার (নহুশ শর্মা), সুমিত্রা মুখার্জী (সরস্বতী), উৎপল দত্ত (রাধাকান্ত দেব)।

বৈশাখী মেঘের কাহিনী ১৯৫০-এর এক সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যাসব্যাকের সাহায্যে ১৯৩১ সালের জাতীয়তাবাদী ঘটনাকে কেন্দ্র ßËõþ সংগঠিত ব্যাঙ্ক লুটের ঘটনায় প্রবেশ করে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ বিজয় ঘোষালকে গ্রেফতার করতে এলে মোহিত ও কমলেশে দ্বারা আত্রান্ত হয়। আহত বিজয়কে টাকা দিয়ে সমুদ্রতীরে এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হয়। মোহিত ও কমলেশের সাথে পুলিশের যে সংঘর্ষ হয় তাতে শেষ পর্যন্ত মোহিতই বেঁচে যায়, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বিচারে মোহিতকে যাবজ্জীবন দেশান্তরে পাঠানো স্থির হয় এবং তার প্রেমিকা শুভ্রা, যে আন্দোলনের সাথে বরাবর যুক্ত ছিল তাকেও মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এখান থেকে ছবি সামনে এগিয়ে ১৯৫০ সালের আরেক বিচার দৃশ্যে উপস্থিত হয়, যেখানে বিজয় ঘোষাল মো

হিতকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়। মোহিত তার উত্তরে শুধু স্মরণ করিয়া দেয় যে, তাকে বাঁচানোর জন্য মোহিত, মোহিতের পরিবারএবং শুভ্রা একদিন সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিল। মোহিতকে ২০ বছরের কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয় এমন এক দেশে যার মুক্তির পেছনে তারও অবদান আছে। এছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ উৎপল দত্ত, ক্যামেরা ঃ দীনেন গুপ্ত, সংগীত ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদনা ঃ ঋষিকেশ মুখার্জী, অভিনয়ে ঃ সুমিত্রা, শোভা, রবি, সত্য, উৎপল।

উৎপল দত্তের শেষ ছবি মা যা আসলে মাক্সিম গোর্কির ঝিবিশ্রুত উপন্যাসকে ভিত্তি করেই নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে ঘটনাস্থল দার্জিলিং - এর চা বাগান এবং সেখানকার লোকজন। ময়ের উপর অপ্রকৃতিস্থ বাবার অত্যাচার ছোট্ট ছেলে প্রদীপ তামাং সহ্য করতে না পেরে একদিন সে তার বাবাকে হত্যা করে। এই প্রদীপই কালত্রমে চা বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। মালিকের অত্যাচার নেমে আসে। এ পর্যায়ে মায়ের ভূমিকা গুত্বপূর্ণ আকার নেয়। একদিন ম্যানেজারকে হত্যা করা হয়। প্রদীপের সাত বছরের জন্য কারাদন্ডহয়। কোর্টে ছেলের ভাষণের মুদ্রিত লিপি বিলি করার সময় মাওগ্রেফতার হন। ছবিটি স্লোগান কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্তৃক প্রযোজিত। ক্যামেরা ঃ দীনেন গুপ্ত,, সংগীত ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদনা ঃ ঋষিকেশ মুখার্জি, চিত্রনাটা ও পরিচালনা ঃ উৎপল দত্ত, অভিনয় ঃ শোভা সেন (মা), দেবজিৎ ভট্টাচার্য (প্রদীপ -- পাভেল) এবং সত্য, বিষ্ণুপ্রিয়া, পদম লামা ইত্যাদি।

উপরের ছবিগুলির যে কাহিনী সূত্র দেওয়া হল তা যেমন একদিকে আমাদের ছবির বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে, অন্যদিকে একই সময় তা আমাদের মনে এই ধারণার জন্ম দেয় যে, উৎপল বাবুর সব ছবিই মূলতঃ ন্যারেটিভ এবং চলচিচত্রের আঙ্গিকগত দাবি অর্থাৎ যেমন তার চিত্রময়তা যা আসলে কিছু নির্দিষ্ট প্রকরণ কৌশলকে আশ্রয় করেই প্রতিষ্ঠা পায় তা তার ছবিতে বলতে গেলে একেবারে অনুপস্থিত। সব ছবিগুলিতেই ঘটনা ও সংলাপের আধিক্য তাদের সম্পূর্ণ অর্থে চলচিচত্র হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু ছবির বিষয় সংশয়হীনভাবে আমাদের মনে এই ধারণা গেঁথে দেয় যে, একজন চিত্রনির্মাতা কত আন্তরিকভাবে তার মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তার কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আজকের ছায়াছবির জগতে এই সততার মূল্য অপরিসীম। ইন সার্চ অফ্ থিয়েটার---চার পর্বে বিন্যস্ত ফিচারধর্মী তথ্যচিত্রে উৎপল দত্ত থিয়েটারের দৃশ্য ও ভাষণ সহযোগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রগতিশীল ঐতিহ্যের ধারাকে শু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত করেছেন। স্বাভাবিক কারনেই প্রথম পর্বে লেবেডেভকে দেখানো হয়েছে. ১৯৭৫ সালে তার কাল্পনিক সঙবদল এর প্রজোযনা এবং ২৫নং ডোমতলা স্ট্রীট ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মিলনকেন্দ্র হয় দাঁড়ানোর ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠীর তীব্র ঘৃণা । লেবেডেভের থিয়েটার পুড়িয়ে দেওয়া, তাকে হাজতে পাঠানো এবং তার রাশিয়ায় ফিরে যাওয়া। প্রথম পর্ব শেষ হয় লেবেডেভের নেপথ্য কণ্ঠে ঃ ‘I did not contemplate that in a kingdom ruled by merchants my efforts would inflame such hatred.’ সাথে সাথে ঘোষকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ঃ The theatre in Calcutta has born in revolt. The very act of staging a play who considered seditions by English rulers.

দ্বিতীয় পর্বে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব এবং বাংলা থিয়েটারকে ধনীর দাক্ষিণ্য থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই চেতনার উন্মেষ যে, ‘Theatre would have to be freed from private patronage. Only a public theatre, dependent solely on public money, on the sale of tickets, could be free. অর্ধেন্দুশেখর ও গিরীশচন্দ্রের নাটকের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ।

তৃতীয় পর্বে যাত্রা ও শেকস্পীয়ারের ঐতিহ্য থেকে যে বাংলা থিয়েটারের উদ্ভব তার আলোচনা। বুর্জোয়া বাস্তবতানয়, নয় ড্রইং মড্রামা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, মন্মথ রায়, অমৃতলাল বোস, দীনবন্ধু , ডি. এল. রায়, রবীন্দ্রনাথে ইত্যাদির নাটকের মধ্য দিয়ে সামন্ত মূল্যবোধ, কুসংস্কার, শোষণ, অন্যায় - অবিচারের বিদ্ধে মানবতার দৃঢ় পদক্ষেপ।

চতুর্থ পর্ব নবান্ন প্রযোজনা থেকে শু করে বর্তমান নাট্য প্রযোজনার উত্তরণের ইতিহাস। উৎপল দত্তের বিভিন্ন নাটকের উদ্ধৃতির সাহায্যে রাজনৈতিক জীবনে হিংসার সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি।